১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত মোট ছটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল—ইলবারি তুর্কি (১২০৬-৯০), খল্‌জি (১২৯০-১৩২০), তুঘলক (১৩২০-১৪১৪), সৈয়দ (১৪১৪-৫১), লোদি (১৪৫১-১৫২৬) এবং শূর (১৫৪০-১৫৫৬)। ১৫২৬-১৫৪০ পর্যন্ত মোগলরা ক্ষমতায় ছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুর্কিরা বাংলায় লক্ষ্মণাবতী, রাজস্থানে আজমীর ও রণথম্ভোর, দক্ষিণে উজ্জয়িনী এবং পশ্চিমে মুলতান ও সিন্ধু পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। তুর্কিদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে নানাধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এজন্য পরবর্তী প্রায় একশ বছর ধরে তাদের রাজ্য প্রায় গতিহীন, নিশ্চল হয়ে ছিল। তুর্কিদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা ছিল। প্রথমত, রাজস্থান, বুন্দেলখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বায়ানা ও গোয়ালিয়রের শাসকরা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালিয়েছিল। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্থানপতন ছিল, রাজপুতরা কখনো সংঘবদ্ধভাবে তুর্কিদের বিতাড়নের প্রয়াস চালায়নি। গঙ্গা উপত্যকা বা পাঞ্জাবে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়নি, একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মৈজুদ্দিনের বিরুদ্ধে খোক্করদের বিদ্রোহ। যেহেতু রাজপুত রাজারা তুর্কিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি, তাঁদের ব্যক্তিগত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে 'তুর্কিদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিক্রিয়া' বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কি শাসকদের এই অস্থিরতা দমনের জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়েছিল। কয়েকজন তুর্কি শাসক নিজেদের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি ও তাঁর বংশধররা লক্ষ্মণাবতী ও বিহারকে দিল্লির প্রভাবমুক্ত রাখার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয় ছিল। কিছুকালের জন্য দিল্লি ও লাহোরের অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল। মাঝে মাঝে প্রাদেশিক গভর্নররা (ইক্‌তাদার) দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলত, তুর্কি শাসনের শুরু থেকে ভারতে আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছিল।

দিল্লি সুলতানির সূচনা থেকে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক উত্থানপতন তার উপর প্রভাব বিস্তার করত। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর ঘুরি সাম্রাজ্য ভেঙে

পড়েছিল, মৈজুদ্দিনের প্রিয় ক্রীতদাস তাজউদ্দিন ইলদুজ গজনির শাসক হন। অন্য আর একজন ক্রীতদাস নাসিরুদ্দিন কুবাচা মুলতান ও উচের অধিকার লাভ করেন। লাহোরের আমীরদের আমন্ত্রণ পেয়ে কুতুবুদ্দিন লাহোর যান এবং দিল্লি সুলতানির সিংহাসনে বসেন। আইবক ও কুবাচা ইলদুজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, পাঞ্জাব নিয়ে এঁদের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। আইবক লাহোরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন, লাহোর ছিল তাঁর রাজধানী। মার্ভের খাওয়ারিজম শাহ্ ছিলেন মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক, তিনি ঘুর ও গজনি দখল করে নেন। গজনি ও ঘুর অধিকার করে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগেই তিনি মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খান ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও খোরাসান অধিকার করেন। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার শহরগুলি মোঙ্গল আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়, নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলেছিল, কারিগর, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস করা হয়। মোঙ্গল আক্রমণের ভালো দিক হলো এই অঞ্চলে বাণিজ্যের উন্নতি হয়, শহর ও শহরজীবন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। চিঙ্গিজ খান খাওয়ারিজম রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, ট্রান্স-অক্সিয়ানা, সমরকন্দ ও বুখারার পতন ঘটে। খাওয়ারিজম শাসক জালালুদ্দিন মঙ্গবর্নী গজনি ও ঘুরে চিঙ্গিজকে বাধা দিয়ে তাঁর বিরাগভাজন হন। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতীরে তিনি মঙ্গবর্নীকে পরাস্ত করেন, জালালুদ্দিন সিন্ধু অতিক্রম করে পালিয়ে যান। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তুর্কি শাসকরা দিল্লি সুলতানিকে সংহত করার সুযোগ পান। মোঙ্গলদের উত্থান এবং মধ্য এশিয়ার ঘুর সৈন্যবাহিনীর সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবার জন্য ভারতে তুর্কি শাসকগোষ্ঠী দিল্লি সুলতানির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যু হলে মধ্য এশিয়ার রাজনীতির সঙ্গে দিল্লির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে তুর্কি শাসকরা সুলতানি গড়ে তোলেন, এদেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁদের গঠন করতে হয়। ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে নতুন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে উঠেছিল।

কুতুবউদ্দিন আইবক—দিল্লি সুলতানির প্রথম শাসক

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর লাহোরে আমীরদের সমর্থন নিয়ে সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তরাইনের দুই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সুলতানি রাজ্যের বিস্তারে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য ছিল, তিনি সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি মৈজুদ্দিনের সহকারী

হিসেবে কাজ করতেন কিন্তু তিনি তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। নিজের প্রতিভাবলে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, অল্পকাল পরে ঘুরের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুসলিম আইনে একজন ক্রীতদাস শাসক হতে পারেন না। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ লিখেছেন যে সেইসময় ভারতে প্রতিষ্ঠিত তুর্কি রাজ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। দিল্লি সরকার তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, তুর্কি নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। ঘুরির নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন না। মধ্য এশিয়ায় খাওয়ারিজম শাসক শক্তিশালী হয়ে উঠে গজনি দখলের কথা ভাবেন। হিন্দুরা প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলে তুর্কি শক্তিকে আক্রমণ করতে থাকে, হাত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দিকে নজর দিয়েছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কালিঞ্জর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং চান্দেল্ল রাজা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহু হিন্দু নেতা তুর্কিদের বিরোধিতা করার কথা ভেবেছিল। গহড়বাল শাসন তখনো নিঃশেষ হয়নি, এই বংশের শাসক হরিশচন্দ্র বদায়ুন ও ফারুখাবাদ জেলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিহাররা গোয়ালিয়র উদ্ধার করেছিল। পূর্বদিকে মুসলিম শক্তির ওপর বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। দূরত্ব ও খল্‌জিদের গোষ্ঠী দ্বন্দের জন্য বাংলায় ও পূর্ব ভারতে মুসলিম শক্তির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর সময় সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার ওপর তুর্কিদের প্রাধান্য ছিল। এখানে রাজপুত প্রতিরোধ ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে।

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরি রাজ্যলাভ করেন। তিনি উদ্যমী বা দক্ষ ছিলেন না। মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর খাওয়ারিজম শাহ আগ্রাসী হয়ে উঠে গজনি দখলের পরিকল্পনা করেন। মৈজুদ্দিনের তিনজন প্রধান অনুগামী কার্যত তাঁর রাজ্য ভাগ করে নেন। তাজউদ্দিন ইলদুজ গজনি দখল করে আফগানিস্তান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী কারঘান ও সঙ্কুরণ অধিকার করেন। তাঁর জামাতা নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধু (উছ) অধিকার করে শাসক হয়ে বসেন। আর হিন্দুস্তানের অধিকর্তা ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবক। ইলদুজ শুধু গজনি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি সমগ্র দিল্লি রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করেন। আইবক মধ্য এশিয়ার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে বিব্রত ছিলেন, তিনি ভারতে সুলতানি রাষ্ট্রের সংহতিকরণের কাজে মন দিতে পারেননি। সুলতান হওয়ার পর বেশিরভাগ সময় তিনি লাহোরে কাটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং দানশীল ব্যক্তি, প্রভুর প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন অবিচল। বলা হয়েছে গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে সুলতান উপাধি দেন। দাবি করা হয়েছে যে তাঁর নামে খুৎবা

পাঠ করা হয় এবং তাঁর নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করে চালু করা হয়। তাঁর কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি, আর খুৎবা পাঠের কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

ক্ষমতালাভের পর আইবক মাত্র চারবছর বেঁচে ছিলেন। এই চারবছর তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্য এশিয়ার অস্থির রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ইলদুজের ওপর খাওয়ারিজম শাহের চাপ বাড়লে তিনি লাহোরের দিকে অগ্রসর হন, আইবক তাকে প্রতিরোধ করেন, সিন্ধুর অপর পারে তাকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। আইবক গজনি জয় করার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। গজনি জয় করলে তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে যেতেন। খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়তেন, এতে দিল্লি সুলতানির নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ত। আইবক লাহোর দখল করে রেখে সিন্ধুকে তাঁর সীমান্ত হিসেবে মেনে নেন। সিন্ধুর অপর পারের রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়াননি। তিনি গজনির সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেননি তবে স্বাধীনভাবে দিল্লি সুলতানি চলতে থাকে। তিনি এর স্বতন্ত্র বিকাশের পথ ধরেন। হাবিব ও নিজামী লিখেছেন যে আইবক দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটি তৈরি করে দেন। তিনি দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন—একটি হল এর স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা, অপরটি হল এর সীমান্ত নির্ধারণ করা। এই দুটি লক্ষ্য তিনি আংশিকভাবে পূরণ করতে সক্ষম হন, তবে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের দিকে নজর দিতে পারেননি (Aibak remained preoccupied with the problem of preserving his government's separate entity and of establishing a political frontier. That task was still unaccomplished when be died in A.D. 1210. But he had successfully initiated a state and outlined its foreign policy)।

উচ্চমানের এবং প্রভূত উদ্যমের অধিকারী আইবকের চরিত্রে তুর্কিদের সাহসিকতা এবং পারসিকদের বদান্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল, অত্যন্ত দানশীলতার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'লাখ বক্স'। আবার তুর্কিদের মতো তাঁর চরিত্রে নিষ্ঠুরতার অভাব ছিল না, লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সমকালীন লেখকরা তাঁর উদারতা, দানশীলতা ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। সে যুগের অনেক তুর্কি শাসক উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন অথচ যুদ্ধে এরা ছিলেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। হাসান নিজামী ও ফকরে মুদাব্বির দুজনেই তাঁর মধ্যে এক সংবেদনশীল পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁদের রচনা তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন। অন্তত দুটি ঘটনায় পরাজিত হিন্দু রাজাদের পক্ষে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে অনুরোধ রেখেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশ্বস্ত কাজের জন্য মৈজুদ্দিন ভারতে তাঁর অধিকাংশ সাফল্য লাভ করেন। দিল্লি রাজ্য গঠনের বিশদ পরিকল্পনা এবং শক্তির জোগান দিয়েছিলেন কুতুবুদ্দিন

আইবক। দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটির তিনি হলেন প্রথম রূপকার, এর বৈদেশিক নীতির স্রষ্টা।

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১০) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর লাহোরে আমীরদের সমর্থন নিয়ে সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তরাইনের দুই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সুলতানি রাজ্যের বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল, ভারতের রাজনীতিতে তাঁর নিঃসন্দেহে প্রাধান্য ছিল। তিনি মৈজুদ্দিনের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন কিন্তু তিনি মৈজুদ্দিনের মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন (ওয়ালিআহদ) একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নিজ প্রতিভাবলে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, অল্পকাল পরে ঘুরের শাসক সুলতান মাহমুদ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুসলিম আইনে একজন ক্রীতদাস শাসক হতে পারেন না। এই ঘটনার পর হিন্দুস্তানে গজনির শাসকের আর কোনো দাবি ছিল না। গোড়াতেই মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে দিল্লি সুলতানি মুক্ত হয়েছিল। ক্ষমতালাভের পর আইবক মাত্র চার বছর বেঁচে ছিলেন। ঐসময়ে তিনি দিল্লি সুলতানির বিস্তারের কাজে মন দিতে পারেননি। লাহোরে চৌগান খেলার সময় তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালের তাৎপর্য হলো দিল্লি সুলতানি স্বাধীনভাবে বিকাশের পথ ধরেছিল। সমকালীন লেখকেরা তাঁর উদারতা, দান ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তিনি একসঙ্গে লক্ষ টাকা দান করতেন ('লাখ বক্স'); আবার লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করতেন না। উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ কিন্তু যুদ্ধে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা সেযুগের অনেক তুর্কি শাসকের মধ্যে দেখা যায়।

প্রারম্ভিক পর্বে তুর্কি সুলতানগন - (1206-1290) খ্রিঃ

▲ কুতুবউদ্দিন আইবক (1206-1210) A.D.

ভিনসেন্ট স্মিথ, এলফিনস্টোন — 'দাস বংশ' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

কে. এ. নিজামী — দাস বা মামেলুক বা ইলবারী তুর্কি বংশ কথা গুলির পরিবর্তে প্রারম্ভিক পর্বে তুর্কি সুলতান গন কথাটি বলেন।

* আইবক কথার অর্থ - চাঁদের মত সুন্দর

1192 খ্রিঃ দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের পর মহঃ ঘোরী কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতের বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব দেন।

1206 খ্রিঃ মহঃ ঘোরী কর্তৃক কুতুবউদ্দিন আইবককে আনুষ্ঠানিক ভাবে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়।

1206 খ্রিঃ 24শে জুন তিনি লাহোরের সিংহাসনে আরোহন করে ক্ষমতা হাতে নেন।

* কুতুবউদ্দিন আইবক মালিক ও সিপাহসালার উপাধি নেন।

1208 খ্রিঃ মহঃ ঘোরীর উত্তরসূরী গিয়াসউদ্দিন ঘোরী কুতুবউদ্দিন আইবককে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সুলতান উপাধি দেন।

সার্বভৌমত্ব লাভ

সমস্যার সমাধান

(i) গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজ পাঞ্জাব জয় করতে উদ্যত হলে কুতুবউদ্দিন তার রাজধানী দিল্লী থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত করেন এবং ইলদুজ এর সামরিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন।

(ii) বাংলায় বখতিয়ার খলজীকে হত্যা করে আলি মর্দান সেখানকার স্বাধীন শাসকে পরিনত হন কিন্তু আমীর-ওমরাহদের বিরোধিতায় তিনি পদচ্যুত হন। কুতুবউদ্দিন আইবক আলিমর্দানকে বাংলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।